The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

[Methods of Studying History : Islamic Perspective]

Gulshan Akter
PhD Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 25 January 2025
Received in revised: 09 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Method, Study, History, Islamic, Perspective.

ABSTRACT

History is the study of the past events and their causes and effects. The main subject of history is the description of the progress of human society. Studying history involves over time as different sources, various methods, including research, source analysis, engaging with different forms of historical evidence and perspectives have been used by historians. Historians use the historical method to understand past events, their causes, context and implications. This involves examining primary and secondary sources, conducting archival research, and analyzing social and cultural contexts. Through studying history, we can learn how past societies, systems, ideologies, governments, cultures and technologies were built, how they operated, and how they have changed. The rich history of the world helps us to plain a detailed picture of where we stand today. Thus Methods are the ways that historians analyze and evaluate the sources, such as chronology, comparison, causation, continuity and change, etc. Historians need to use appropriate and rigorous methods to support their arguments and conclusions. Similarly The Study of history is very important in Islam. While there are many advantages to studying history and there are also some disadvantages. The failure to take this into account properly has led to the development of an inferiority complex about their own past and misconceptions about their predecessors among many readers of history. Many are accustomed to studying history and historical philosophy imported from West (Europe); they are unaware of the fundamental principles followed by Muslim historians. Naturally, any study of scripture in an irregular manner will lead to errors. In general history, all subject can be studied without any scrutiny, but Islamic history has to be studied while keeping Islamic values and beliefs intact. So, There are certain principles for studying history in Islam, which an attempt has been made to highlight in this article.

১. ভূমিকা

ইতিহাস হলো মানুষের অতীত ঘটনা ও কার্যাবলির অধ্যয়ন। এটি শুধু নিছক কিছু ঘটনার ধারাবিবরণ নয়, এমনকি বিগত ঘটনাপ্রবাহের সংরক্ষণও নয়। ইতিহাস হলো শিক্ষা-উপদেশ এবং দীক্ষা ও পরিচর্যার এক চিরন্তন পাঠশালা। ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে মানবসমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি-বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস পাওয়া যায়। কেননা ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো মানব সমাজের অগ্রগতির ধারা বর্ণনা। সভ্যতার প্রধান প্রধান স্তর ও এর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপট, কারণ, প্রসঙ্গ ও প্রভাব ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়। সঠিক ইতিহাস বিশ্লেষণ ও উদঘাটনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিকগণ বেশ কিছু নীতিমালা ও পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি কোনো বিশেষ ঘটনা বা কার্যাবলি সম্পর্কে গবেষণা, উৎস বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক সত্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস অনুসন্ধান ও প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সাধারণ ইতিহাস ও ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত নীতিমালায় বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণ ইতিহাসে তদন্তের মাধ্যমে আবিষ্কৃত সকল ঘটনা বা ফলাফল ও অনুসিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধপূর্বক তা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু ইসলামী ইতিহাসে শুধু সত্যতার ভিত্তিতে ইতিহাস গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয় না; বরং এর পদ্ধতিসমূহ অন্তর্নিহিত ধর্মীয় ব্যাখা-বিশ্লেষণের সাথেও জড়িত। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কতিপয় উপকারী ও ক্ষতিকর দিক রয়েছে; যা আমাদের জানা একান্তভাবে জরুরি।

২. ইতিহাসের পরিচয়

ইতিহাস শব্দটি সংস্কৃতি। ইতিহাস শব্দটির উৎপত্তি 'ইতিহ' শব্দ থেকে। এখানে 'ইতিহ' অর্থ 'ঐতিহ্য'। অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে তাকে ঐতিহ্য বলা হয়। এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেকপ্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস। আর 'আস' শব্দের অর্থ রেখে দেওয়া বা টেনে আনা। সুতরাং ইতিহাস শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষের অতীতের ঘটনা, কার্যকলাপ বা কাহিনীকে সামনে টেনে আনা বা বর্তমানে বিন্যাস করা।

ইতিহাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ History। আর ইংরেজি History শব্দটি এসেছে গ্রিক ও ল্যাটিন Historia শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা। ইতিহাসের জনক হিসেবে খ্যাত গ্রিসের হেরোডোটাস তার গ্রিক ও পারসিকদের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের ঘটনা সংবলিত গ্রন্থের নামকরণ করেন Historia (যার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে (Histories)। ঘটনার অনুসন্ধান অর্থেই হেরোডোটাস তার বিখ্যাত গ্রন্থ The Histories তে Historia/ History শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।[১]

আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষায় ইতিহাসের আরবী প্রতিশব্দ আত্-তারীখ التاريخ. এটি و ر خ শব্দমূল হতে নির্গত; এর ব্যবহার সকল সামী ভাষায় দৃষ্ট হয়। শাব্দিক অর্থ সময় জানানো। যেমন বলা হয়- أَرْخت الكتاب تَأرِيْخًا وَوَرخته تَوْرِيْخًا. 'আমি গ্রন্থের সময় নির্ণয় করেছি বা গ্রন্থে তারীখ সংযুক্ত করেছি।'[২] এছাড়া শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, সময় জানানো, যুগ, হিসাব, সময় নির্ধারিতকরণ প্রভৃতি। সাধারণভাবে ইতিহাস অর্থে ঐতিহাসিক বিবরণী *(annals)*, সময়ানুক্রমিক ও ধারাবাহিক ঘটনা বিবরণ *(chronicales)*। কেননা তারীখ বা ইতিহাসকে কোনো কিছু সংঘটনের সময় দ্বারা পরিমাপ করা হয়। মানুষের একত্রে বসবাসকে '*তামাদ্দুন*' (সংস্কৃতি) এবং সেই সমাজবদ্ধ জনপদকে '*মদীনা*' (নগর) বলে। এদের উপর দিয়ে স্বভাবসিদ্ধভাবে অবস্থাদি অতিক্রান্ত হয় তাকে '*তারীখী ওয়াকিয়াত*' (ঐতিহাসিক ঘটনাবলী) এবং পরবর্তীদের পূর্ববর্তীদের মুখ থেকে শুনে শুনে সে ঘটনাবলীকে সম্বলিত করা এবং শিক্ষণীয় উপদেশ স্বরূপ তা পূর্ববর্তীদের জন্যে রেখে যাওয়াকে '*তারীখ*' বা ইতিহাস বলে। কেউ কেউ বলেন, মূল আরবী '*তা'খীর*' (تاخير) শব্দটিকে উল্টিয়ে '*তারীখ*' (تاريخ) শব্দটি বানানো হয়েছে। তাখীর অর্থ পরবর্তীতে নিয়ে আসা, পূর্ববর্তী যুগকে পরবর্তী যুগের দিকে সম্পর্কিত করা। যেমন বলা হয়,অমুক ধর্ম বা অমুক সাম্রাজ্য বা অমুক যুদ্ধের উদ্ভব অমুক সময় হয়েছিল। যে বিশেষ ঘটনাবলী সে যুগটাতে ঘটেছিল, সে সবের শুরু বা সূচনাই হচ্ছে সে সময়টি।

মোটকথা, *তারীখ* বা ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে এরূপ অনেক বিশেষণ রয়েছে। তার সবকটির সারমর্ম হচ্ছে প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটি। আরো সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, যে সকল অবস্থা ও ঘটনাবলী কাল নির্দেশ করে লিখিত হয়, তাকেই ইতিহাস বলা হয়ে থাকে।[৩]

ইসলামের পরিভাষায় অতীত চিত্র এবং তার মধ্যে সংঘটিত ঘটনা কিচ্ছা-কাহিনী এবং শিক্ষণীয় বিষয়াবলীর বাহক। যা পরবর্তীদের জন্য উত্তম পথিক তাকে ইতিহাস বা তারীখ বলা হয়। মূলত এ বিদ্যা জ্ঞানের সংরক্ষণকারী বিষয় যা জ্ঞানসমূহ অতীত থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতকালের জন্য বহজন করে আনে। এ জ্ঞান মানবীয় জ্ঞানসমূহের মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়টি অধিক চিন্তাভাবনার দাবী রাখে। এর মধ্যে মানবীয় ধারাবাহিকতায় মানুষের স্থান এবং সামাজিক অবকাঠামোতে তার অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। জাতি গঠন, তার বৈধতায় উন্নতি ও অবনতির ক্ষেত্রে খোদা প্রদত্ত নিয়মনীতি সংক্রান্ত জ্ঞানের কেন্দ্র, উপদেশ স্থল এবং শিক্ষাগ্রহণের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো *আত্-তারীখ* (التَّارِيخ) বা ইতিহাস।[৪]

১. ইমাম শামসুদ্দীন আস্-সাখাভী র. (মৃ. ৯০২ হি./১৪৯৭ খ্রি.) বলেন, اَلْبَحْثُ عَنْ وَقَائِعَا لِزَمَانِ بِالتَّوْقِيْتِ

'সময় নির্ধারণ করে যুগের ঘটনাবলী আলোচনা করাকেই ইতিহাস বলে।'[৫]

২. ইব্নু খালদূন (মৃ. ৮০৮ হি./১৪০৬ খ্রি.) বলেন,

التّأرِيْخ فَنٌّ عَزِيْزُ الْمَذْهَبِ جَمُّ الْفَوَائِدِ شَرِيْفُ الْغَايَةِ إِذْ هُوَ يُوْقِفُنَا عَلَى أَحْوَالِ الْمَاضِيْنَ مِنَ الأُمَمِ فِيْ أَخْلاَقِهِمْ. وَالأَنْبِيَاءِ فِيْ سِيْرِهِمْ. وَالْمُلُوْكِ فِيْ دُوَلِهِمْ وَسِيَاسِتِهِمْ. حَتَّى تَتِمُّ فَائِدَةُ الاِقْتِدَاءِ فِيْ ذَلِكَ لِمَنْ يَرُوْمُهُ فِيْ أَحْوَالِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا.

'*আত্-তারীখ* হলো অধিক মতামত সম্বলিত পরিপূর্ণ উপকারী শুভ পরিণতি সংক্রান্ত একটি বিষয়। যেহেতু তা আমাদেরকে অতীত জাতি পুঞ্জের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন অবস্থাবলী, নবীগণের জীবনী, রাজা-বাদশাহ্গণের রাজত্ব ও রাজনীতি সম্পর্কে এমনভাবে অবগত করায়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে ব্যক্তি এর অনুসন্ধান করে দীন ও দুনিয়ার সার্বিক অবস্থায় তা পেতে চায়। তারীখের অনুসরণের উপকারীতা তার জন্য পরিপূর্ণতা লাভ করে।'[৬]

৩. মাওলানা আকবর শাহ খান নাজিবাবাদী (মৃ. ১৯৩৮ খ্রি.) তার '*তারীখুল ইসলাম*' গ্রন্থে ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলেন,

ইতিহাস হচ্ছে ঐ বিদ্যা যার মাধ্যমে রাজা-বাদশাহ, নবী-রাসূল, বিজেতা ও বিখ্যাত মনীষীগণের জীবন কাহিনী এবং অতীত যুগের বড় বড় ঘটনাবলী ও রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং যা বিগত যুগসমূহের সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে।[৭]

সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ সভ্যতার বর্তমান স্তরে পৌঁছেছে তার প্রমাণ ভিত্তিক বিবরণই হচ্ছে ইতিহাস। অর্থাৎ মানুষের অতীত কার্যালয় গবেষণালব্ধ সত্যের উপস্থাপনই হচ্ছে ইতিহাস।

৩. ইতিহাস অধ্যয়নের মৌলিক দিকসমূহ

ইসলামের দৃষ্টিতে ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। যথা-

- **ক. তথ্য-উপাত্ত বর্ণনার সনদ যাচাই করা:** ইতিহাস অধ্যয়নের সময় সনদের সত্যতা বিচার করতে হবে। কেননা ঐতিহাসিক সনদের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদগণ মুহাদ্দিসগণের মতো কঠোরতার শর্ত আরোপ করেন না। ইতিহাস রচনায় কখনো মুরসাল, কখনো মুনকাতে বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হাদীসের অনুরূপ শর্ত ও নীতিমালা প্রযোজ্য হয়নি। তাই ইতিহাস অধ্যয়নকারৈ গবেষক বা পাঠককে এ ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- **খ. বর্ণনার বক্তব্য যাচাই করা:** সনদ বিশুদ্ধ হলেই কেবল বর্ণনা বা মতনকে গ্রহণ করেননি মুসলিম ঐতিহাসিকগণ। এ ক্ষেত্রে মতন বা ভাষ্যকেও যাচাই করা হয়েছে। এজন্য অবলম্বন করা হয়েছে সূক্ষ্ম মানদণ্ড। কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ যাচাই-বাছাইপূর্বক বর্ণনার সত্যতা প্রমাণিত হলে তখন তা অধ্যয়ন করা ও বিশ্বাস করা যাবে।

৪. ইতিহাসের অধ্যয়নের উপাদান

ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তাকেই ইতিহাসের উপাদান বলা হয়। ইতিহাসের উপাদানের সাথে ইতিহাস অধ্যয়ন পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সঠিকভাবে ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য এসকল উপাদানের উপর ঐতিহাসিকগণ একান্তভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানে মানুষের অতীত ইতিহাস জানার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। বর্ণমালা আবিষ্কারের পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস জানার জন্য সে যুগের মানুষের তৈরি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। সাধারণত ইতিহাস অধ্যয়ন করার পূর্বে নিম্নোক্ত দুইটি উপাদান বিশ্লেষণ করা জরুরি। যথা: ক. লিখিত উপাদান এবং খ. অলিখিত উপাদান।

- ক. লিখিত উপাদানের মধ্যে সাহিত্য, মুদ্রা, শিলালিপি, নথিপত্র, জীবনী, রোজনামচা বা ডায়েরি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। যেমন- বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কলহনের 'রাজতরাঙ্গণী', মিনহাজ-উস-সিরাজের '*তাবাকাতে নাসিরী*', আবুল ফজলের 'আইনে আকবরী' ইত্যাদি।
- খ. অলিখিত উপাদানমূলক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। যেমন- মূর্তি, ভাস্কর্য, স্মৃতিস্তম্ভ, মানুষের তৈরি হাতিয়ার, সৌধ, পোশাক, ইমারত, ব্যবহৃত বাসন-কোসন, খাদ্যশস্যসমূহ ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও তার নিদর্শন এর উদাহরণ। এসব উপাদান সঠিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটা যুগের বিশেষ সময়ের ইতিহাস জানা যায়।[৮]

মাওলানা আকবর শাহ খান নাজীব আবাদী তার '*তারীখুল ইসলাম*' গ্রন্থে ইতিহাসের উপর্যুক্ত দুটি উপাদান বা উৎসের পাশাপাশি আরো একটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো- শ্রুতি নির্ভর নিদর্শনাবলী। এতে অন্তর্ভুক্ত লোকশ্রুতি, লোক কাহিনী, কবিতা ও প্রবাদবাক্য প্রভৃতি।[৯]

সুতরাং তীক্ষ্ম প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম, উদ্যম ও অর্ন্তদৃষ্টি ব্যতিরেকে ইতিহাসের এসব উপাদান একান্তই তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। এসব উপাদান থেকে উপকৃত হওয়া এবং ইতিহাস বিন্যস্ত করা কোনো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের বৈশিষ্টমূলক আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি রূপ-রেখা এবং ভৌগোলিক অবস্থাদি ও ইতিহাসবেত্তাদের জন্যে সহায়ক হয়ে থাকে। উপর্যুক্ত ইতিহাসের উপাদানে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণপূর্বক ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে, অন্যথায় ইতিহাসের সঠিক কালক্রম উদঘাটন করা ও তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

৫. ইতিহাসের উৎস বিশ্লেষণ

কোনো একটি শাস্ত্রের উৎপত্তির পশ্চাতে উৎস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেইসব উৎসমূলের উপর ভিত্তি করেই শাস্ত্র রচয়িতা বা প্রণেতার মাধ্যমে জ্ঞানের নির্দিষ্ট শাখা বিকশিত হয়ে উঠে। উৎসমূল ছাড়া কোনো একটি বিষয় শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। তেমনি ইতিহাস শাস্ত্রের উৎপত্তির প্রারম্ভে রয়েছে তাঁর উৎসসমূহ। ঐতিহাসিকগণ তথ্য সর্বদা কয়েক প্রকার উৎস থেকে গ্রহণ করেন। বস্তুত প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য উৎস ও আকরের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক আর এ উৎসমূল দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা- ক. মুখ্য উৎস বা *Primary (first hand) Source* অপরটি খ. গৌণ বা অদ্ভূত উৎস বা *Secondary Source*। অতীত, নিকট অতীত ও বর্তমানের ইতিহাসের গণ্ডিভুক্ত ঘটনাবলী অবগত হওয়ার জন্য উপরিউক্ত দুটি উৎস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুখ্য উৎস বা *Primary Source* আবার প্রধান দুটি

বিভাজনে বিভক্ত হয়ে থাকে। যথা- ক. প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা *Archaeological Source* এবং খ. সমসাময়িক ও নিকট সমসাময়িক লিখিত উৎস *Contemporary or near Contemporary written source* ।

ক. প্রত্নতাত্ত্বিক *(Primary Source)* উৎস মুদ্রা, শিলালিপি, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা অন্তর্ভুক্ত করে। এসব উৎস বিভাজন থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধান করা যায়। এবং সেসবের ভিত্তিতে ইতিহাসকোষে নতুন তথ্যের সংযোজন এবং পুরোনো তথ্যের নতুন ব্যাখ্যা গতিময়তা লাভ করে।

খ. সমসাময়িক বা নিকট সমসাময়িক লিখিত উপাদান বলতে বুঝায় ইতিহাস ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়, সরকারি দলীল-দস্তাবেজ, ফরমান ও যোগাযোগপত্র, পর্যটকদের বিবরণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ও প্রচারপত্রাদি এবং আধ্যাত্মিক সাধকদের পত্রাদি *(মাকতুবাত)* ও বক্তৃতামালা *(মালফুজাত)*। উপরের এসব উৎস ও উপকরণের ওপর ভিত্তি করে ও বিচার-বিশ্লেষনের মাধ্যমে যা লেখা যায় তাকে ইতিহাস জ্ঞানের *(Secondary Source)* গৌণ বা উদ্ভূত উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় P.K. Hitti (পি.কে হিট্টি) এর *History of the Arabs* গ্রন্থে আরব জাতি ও সোনালী যুগের অর্ধ গোলার্ধের মুসলমানদের ইতিহাস জানার জন্য একটি সুবিশাল নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থ রচনা করতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসের ব্যবহার ছাড়াও সমসাময়িক এবং নিকট সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের গ্রন্থসমূহ ভালোভালো রপ্ত করে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপাদান গ্রহণ করেছেন। তিনি আরব ঐতিহাসিকগণের লিখিত মুহাম্মদ ইবন ইসহাক র. (মৃ. ১৫১ হি./৭৬৭ খ্রি.) এর *'সিরাতু রাসূলিল্লাহ'* গ্রন্থ থেকে আরম্ভ করে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্-তাবারী (মৃ. ৩১০ হি./৯২৩ খ্রি.) এর *'তারীখ আল-রসূল ওয়া আল-মুলূক'*সহ অন্যান্য সমসাময়িক আরবী গ্রন্থাদি এমনকি আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন খালদূনের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ কিতাব *'আল-ইবার'* ও তার মুকাদ্দামা অধ্যয়ন বাদ দেন নি এবং প্রাসঙ্গিক সকল উৎসের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থটি উদ্ভূত ও গৌণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় এবং উপকরণ আহৃত আকর গ্রন্থসমূহ মুখ্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। ইতিহাস অধ্যয়নে এসব মুখ্য ও গৌণ উৎসসমূহ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। ঐতিহাসিক উৎসগুলির নির্ভরযোগ্যতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য সমালোচনামূলকভাবে তথ্য-উপাত্তের ব্যাখ্যা ও সত্যতা যাচাই ঐতিহাসিকগণের প্রধান কাজ।

৬. ইসলামী ইতিহাসের উৎস বিশ্লেষণ

নিম্নে ইসলামী ইতিহাসের উৎসসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করা হলো :

৬.১ কুরআনুল কারীম: ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশুদ্ধ উৎস হলো কুরআনুল কারীম। যা দীর্ঘ ২৩ বছরে আল্লাহ তা'আলা জীবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সা. এর ওপর নাযিল করেছেন তা কুরআন। এটি মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১০] এতে বিবৃত হয়েছে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও শরয়ী বিধিবিধান। একইসাথে আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেছেন ইতিহাসের বেশ কিছু ঘটনা। কুরআন কারীম জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থ হলেও এতে বিবৃত হয়েছে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে ঘটে আসা ইতিহাসের সারাংশ। কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসের সেই ঘটনাগুলো অন্য সকল উৎসের চেয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত। পৃথিবীর সকল ইতিহাসগ্রন্থও যদি কুরআনে বর্ণিত কোনো ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীতে অবস্থান নেয়, তাহলে ইতিহাসগ্রন্থগুলোর বক্তব্য পরিত্যাজ্য হবে। আল-কুরআনের তথ্যটায় সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। একজন মুসলিমের আকীদা বিশ্বাস এটিই।

কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি তথ্য সুনিশ্চিত, বিশুদ্ধ ও শতভাগ সঠিক। যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً﴾ 'আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে?"[১১]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ﴾

'এটি গায়েবের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না।'[১২] অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾

'আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমন আমি এ কুরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।'[১৩]

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান উৎসই হলো কুরআনুল কারীম। কোনো ঘটনার বিষয়ে যদি কুরআনুল কারীমের আয়াত পাওয়া যায়, তাহলে সেই বিষয়ে আর কোনো সোর্সের বক্তব্য দেখার দরকার নেই। যেমন মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনুল কারীম স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছে। কীভাবে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হলো এবং তিনি দুনিয়াতে এলেন সেই আলোচনা কুরআনুল কারীমে আছে। মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে

বিবর্তনবাদী ধারা আমাদের সামনে ভিন্ন একটি ইতিহাস উপস্থাপন করে। তারা আদিম মানুষের গল্প শোনায়, যারা পাহাড়ে বসবাস করত, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারত না ইত্যাদি ইত্যাদি। যেহেতু তাদের এই থিউরি কুরআনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক, তাই তা পরিত্যাজ্য। এ ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের বক্তব্যই শিরোধার্য।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী বর্ণনা করেছে। তাদের প্রশংসা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবাগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইনজীলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।'[১৪]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের দুটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো- তারা মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর। এখন পরবর্তীকালে রচিত কোনো ইতিহাসগ্রন্থে যদি সাহাবায়ে কেরামের এমন চিত্র উপস্থাপন করা হয়, যাতে দেখা যায় তারা মুমিনদের প্রতি কঠোর ছিলেন, কিংবা কাফেরদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কুরআনুল কারীমের বক্তব্যই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। যদি এমন কোনো বিবরণ বিশুদ্ধ সূত্রে আমাদের সামনে আসে, যেখানে দেখা যায় সাহাবায়ে কেরাম মুমিনদের প্রতি কঠোর হয়েছেন তাহলে বুঝতে হবে সেখানে অবশ্যই কোনো হেকমত রয়েছে। এক বাক্যে বলে দেওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়।আর তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও দাবী রাখে।

মূলকথা হলো, ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান উৎস কুরআনুল কারীম। এই উৎসে বর্ণিত তথ্য বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই এখানে আলোচিত সকল তথ্য গ্রহণ করা যায়।

৬.২ আল-হাদীস: কুরআনুল কারীমের পর ইতিহাসের বিশুদ্ধ উৎস হলো আল-হাদীস। হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে ইতিহাসের অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে। কুরআনুল কারীমে জাতিসমূহের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হলেও তা আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে ও বিক্ষিপ্ত আকারে। কারণ ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করা কুরআনের উদ্দেশ্য নয় বরং ইতিহাসের একটি অংশ তুলে ধরে তা থেকে শিক্ষা নির্দেশ করাই উদ্দেশ্য। ফলে কুরআনুল কারীমে আমরা ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত বিবরণ পেয়ে থাকি, যার অনেক অংশই বর্ণিত নেই সেখানে। যদি পুরো ইতিহাসের সামগ্রিক চিত্রটি পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে দ্বারস্থ হতে হবে হাদীসের জ্ঞানকোষে। কারণ হাদীস হলো কুরআনুল কারীমেরই ব্যাখ্যা। এ ছাড়া হাদীসে বিবৃত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সা. এর সীরাতের ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ। ফলে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ধাপ অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যাবে হাদীসের জ্ঞানভাণ্ডারে। বিশুদ্ধতার দিক থেকে এর অবস্থান দ্বিতীয় স্তরে, কারণ হাদীসের মধ্যে নানা শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। সব হাদীসের মান এক স্তরের নয়। কিছু হাদীস আছে অত্যন্ত দুর্বল। আবার হাদীসর নামে অনেক ভিত্তিহীন বর্ণনাও ছড়িয়ে আছে। ফলে হাদীসের ভাণ্ডার থেকে তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। কুরআনুল কারীমের মতো নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যাবে না।

হাদীসেও তিন ধরনের ঘটনার বিবরণ দেখা যায়। এক. অতীতের ঘটনাবলী। দুই. নবী সা. এর জীবনের অংশ। সাহাবায়ে কেরামের জিহাদের বিবরণ। মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক। তিন. ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ। যেমন: দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজ, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ইত্যাদি।

৬.৩ ইতিহাসের সাধারণ গ্রন্থাদি: কুরআনুল কারীম ও হাদীসের পর ইতিহাসের সাধারণ গ্রন্থাদির ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। ঐতিহাসিগণা নানা আঙ্গিকে ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের সবগুলোর মান ও ধরন এক নয়। আমাদেরকে সতর্ক থেকে এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে হবে, কারণ ইতিহাসের গ্রন্থে নানা ধরনের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যার সব সঠিক নয়। খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি./১০৭২ খ্রি.) এর '*তারীখু বাগদাদ*' কিংবা ইবনুল আছীর (মৃ. ৬৩০ হি./১২৩৩ খ্রি.) এর '*আল-কামিল ফিত্ তারীখ*' গ্রন্থে এমন অনেক তথ্য এসেছে বা বিশুদ্ধতার নিরিখে উত্তীর্ণ নয়। আবার কখনো কখনো শিয়া ও অন্যান ফিরকার লোকেরা বিকৃত ইতিহাস রচনা করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছে। যেমন ই'য়াকুবী (মৃ. ২৭৮/২৮৪/২৯২ হি.) রচিত

‘*তারীখু ই‘য়াকুবী*’ কিংবা মাস‘ঊদী (মৃ. ৩৪৬ হি./৯৫৭ খ্রি.) এর লিখিত ‘*মুরুজুয যাহাব*’ গ্রন্থগুলো। ফলে ইতিহাসের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে একইসাথে কাঁটা ও ফুলের মেলবন্ধন। এখান থেকে ফুল তুলতে চাইলে অগ্রসর হতে হবে সতর্কতার সাথে। কিছু মানুষ ইতিহাসের গ্রন্থসমূহকে শতভাগ বিশুদ্ধ মনে করে এর ওপর নির্ভর করে বসে, এটি ভুল। ইতিহাসের বই থেকে শিক্ষা নিতে হবে যাচাই-বাছাই করে। আধুনিক গবেষকদের গ্রন্থগুলো অনেকে নতুন করে তাহকীকসহ প্রকাশ করছেন ফলে এখন উপকৃত হওয়া সহজ হচ্ছে। তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, অনেক মুহাক্কিকও প্রান্তিকতামুক্ত হতে পারেন না। নিরপেক্ষতার পরিচয় না দিয়ে অনেকেই নিজ আকীদা, চেতনা ও পক্ষকে সমর্থনে বহু দলীল উল্লেখ করে তাহকীক ও তার উসূলের মান নষ্ট করে দেন। বিশুদ্ধ তথ্য সরবরাহের পরিবর্তে তারা নিজ ঘরানার চিন্তাধারা উপস্থাপনেই বেশি ব্যস্ত হন। ফলে এই বিষয়টিও ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে।

৬.৪ ভূগোল-বিষয়ক গ্রন্থাবলী

মুসলিম ভূগোলবিদরা ভূগোল বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থে তারা বিভিন্ন শহরের বর্ণনা দিয়েছেন। ভৌগোলিক বর্ণনার পাশাপাশি অনেক সময় ঐতিহাসিক কিছু বর্ণনাও চলে এসেছে এসব গ্রন্থে। যেমন ইয়াকূত আল-হামাভী (মৃ. ৬২৬ হি./১২২৯ খ্রি.) রচিত ‘*মু‘জামুল বুলদান*’ গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন শহরের ভৌগোলিক বর্ণনার পাশাপাশি এসব শহরের কিঞ্চিৎ ইতিহাস, এখানকার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও তাদের অবদান সম্পর্কেও জানতে পারি। অনেক সময় এ গ্রন্থগুলোতে এমন অনেক তথ্যের সন্ধান মেলে যা হয়তো ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থে নেই। ফলে এসব গ্রন্থেও ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, যা ইতিহাসের সাধারণ গ্রন্থাবলীতে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

৬.৫ ভ্রমণকাহিনী

ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ভ্রমণকাহিনি। যুগে যুগে মুসলিম পর্যটকরা বিভিন্ন অঞ্চল ও এলাকা সফর করেছেন। তারপর নিজেদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তাদের এসব ভ্রমণকাহিনীও হয়ে উঠেছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইব্‌ন হাওকাল (মৃ. ৩৬৭ হি./৯৭৭ খ্রি.), ইব্‌ন যুবায়র আন্দালুসী (মৃ. ৬৯২ হি.) কিংবা আবদুল লতীফ আল-বাগদাদী (মৃ. ১২৩১ খ্রি.) তাদের প্রত্যেকের সফরনামাতে রয়েছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইব্‌ন যুবাইর আন্দালুসী ক্রুসেড চলাকালী মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তার সফরনামায় বিভিন্ন এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি (মৃ. ১১৯ খ্রি.) সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। দিমাশকের মাদরাসাসমূহ সম্পর্কেও তিনি কিছু তথ্য দিয়েছেন যা থেকে আমরা মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি। ইব্‌ন হাওকাল সিসিলি ভ্রমণ করেছিলেন। তার ভ্রমণকাহিনীতে তিনি সিসিলির মক্তব সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। আধুনিক গবেষকদের জন্য এ তথ্যগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণকাহিনীতেও ইতিহাসের এমন অনেক তথ্য মেলে যা ইতিহাসের সাধারণ বইপত্রে অনুপস্থিত। এমনকি তার পরবর্তী ঐতিহাসিকরা এসব বইপত্র থেকে তথ্য উদ্ধৃত করেছেন তাদের গ্রন্থে।

৬.৬ সাহিত্যের বইপত্র

সাহিত্যের ধারা আর ইতিহাসের ধারা দুটি ভিন্ন ও পৃথক। সাহিত্যে কল্পনার প্রভাব বেশি থাকে, অপরদিকে ইতিহাসে কল্পনার কোনো স্থান নেই। ফলে ইতিহাসের তথ্য নেওয়ার জন্য সাহিত্যের বইপত্রের ওপর প্রথম ধাপেই নির্ভর করা হয় না। কারণ সাহিত্যের কল্পনার ভেতর থেকে ইতিহাসের তথ্য আহরণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু কখনো সাহিত্যের বইপত্রেও ইতিহাসের কিছু উপাদান পাওয়া যায়, যা থেকে গবেষকরা উপকৃত হতে পারেন।

ক্রুসেডের সময়কালে কবিরা মুসলমানদের বিজয়ের পর যেসব কবিতা রচনা করতেন, তা যদিও সাহিত্যের উপাদান কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োজনীয়তা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। এজন্যই ঐতিহাসিক আবু শামাহ (মৃত্যু ১২৬৭ খ্রি.) তার লিখিত ‘*আর-রওযাতাইন ফী আখবারীদ দাওলাতাইন*’ গ্রন্থে মুসলিম কবিদের লেখা এমন অনেক কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। কখনো কখনো ঐতিহাসিকদের লেখা বই হয়ে উঠেছে সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা। মাক্কারির লেখা ‘*নাফহুত তিব*’ গ্রন্থটি একইসাথে ইতিহাস ও সাহিত্য দুই ধারার প্রতিনিধিত্ব করে আমাদের সামনে উপস্থিত।

৬.৭ আত্মজীবনী

এটিও ইতিহাসের তথ্যের ক্ষেত্রে জরুরী একটি উপাদান। কারণ এতে ব্যক্তি তার জীবনের দেখা ও শোনা ঘটনাবলী লিখে থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে আত্মজীবনী লেখার ধারা শুরু হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। দুই শতাব্দী আগেও এই ধারায় তেমন কাজ হয়নি। কিন্তু গত শতাব্দীতে বেশ কিছু জরুরি কাজ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, শায়খ আলী তানতাবীর (মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.) আত্মজীবনী, হাসানুল বান্নার (মৃ. ১৯৪৯ খ্রি.) আত্মজীবনী, সাইয়্যেদ আবুল হাসান

আলী নদভীর (মৃ. ১৯৯৯ খ্রি.) আত্মজীবনী, যাকারিয়া কান্ধলবির (মৃ. ১৯৮২ খ্রি.) আত্মজীবনী প্রভৃতি। এসব গ্রন্থে তারা তাদের সামসময়িক অনেক জরুরি বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছেন। ভবিষ্যতে যারা গত শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জোগান দেবে এই গ্রন্থগুলো।

৬.৮ দিনলিপি

আত্মজীবনীর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ধারা হলো দিনলিপি। দিনলিপিতেও ব্যক্তি তার সময়কাল ও সমাজ সম্পর্কে অনেকে জরুরি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। মিসরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক জাবারাতি নেপোলিয়নের মিসর হামলার সময় দিনলিপি লিখেছিলেন, যা পরে '*মাজহারুত তাকদিস বি যাওয়ালি দাওয়লাতিল ফারান্সিস*' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সে সময়ের ইতিহাসের অনেক উপাদান তুলে ধরেছেন লেখক, যা পরবর্তী গবেষকদের কাজে এসেছে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় মির্জা গালিব (মৃ. ১৯৬৯ খ্রি.) '*দাস্তাম্বু*' নামে যে দিনলিপি লিখেছেন তা হয়ে উঠেছে ইতিহাসের একটি প্রামাণিক দলীল।

৬.৯ ব্যক্তিগত পত্রাবলি

ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক পত্রাবলি। পত্র লেখার সময় সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়ের জরুরি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। ফলে পরবর্তীদের জন্য এসব পত্র হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ তাথ্যের আকর। রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে পত্র লিখনের উৎপত্তি হলেও খলীফা উমর রা. (মৃ. ২৩ হি./৬৪৪ খ্রি.) এর খিলাফতকালে ব্যাপকতা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে উমাইয়্যা শাসনামলে (২৩-৯৬ হি./৬৪৪-৭১২ খ্রি.) লেখনী শিল্পের বিকাশের এর আরো উন্নতি সাধিত হয়।[১৫] ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ ও ৭ম হিজরীর প্রারম্ভে রাসূলুল্লাহ সা. বিশ্বে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণের মনস্থ করেন। রাসূলুল্লাহ সা. পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে তার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলে তারা তাঁকে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! রাজাবাদশাহগণ সাধারণত মোহরাঙ্কিত পত্র ছাড়া পাঠ করেন না।' অবশেষে সীলমোহর হিসেবে ব্যবহারের জন্য রাসূলুল্লাহ সা. এর একটি আংটি তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুহাম্মাদ, রাসূল ও আল্লাহ এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করে রূপার আংটি তৈরী করা হলে যা পরবর্তী সময়ে রাজাবাদশাহদের প্রতি লিখিত পত্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় সীলমোহর রূপে ব্যবহৃত হয়। এ নববী আংটি রাসূলুল্লাহ সা. ও তৎপরবতী খলীফা আবূ বকর রা. (মৃ. ৬৩ হি./৬৩৪ খ্রি.), উমর রা. ও উসমান রা. (মৃ. ৩৫ হি.) এর খিলাফতকালের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সীলমোহর রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এ আংটি 'বিরে আরীস' নামক কূপে পড়ে যায় এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি।[১৬] রাসূলুল্লাহ সা. ইসলামের প্রতি আহ্বান তথা দাওয়াহর উদ্দেশ্যে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের, হাবশার রাজা নাজ্জাশীর (মৃ. ৬৩১ খ্রি.), মিসরের সম্রাট মুকাওকিসের প্রতি, সিরিয়ার অধিপতি হারিস ইব্‌ন আবী শামির আল-গাসসানী (মৃ. ৬৩০ খ্রি.) প্রমুখ অধিপতি ও সম্রাটগণের নিকট পত্র প্রেরণ করেছেন। ব্যক্তি বিশেষ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন অধিবাসীদের নিকট পত্র প্রেরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. এর পত্রের ভাব, ভাষা, আলংকারিক দিক ও উপস্থাপনার অনন্যতা পাঠকের কাছে এতটাই হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় ছিল যে, সে সব পত্রের আহ্বানে অনেক রাজা-বাদশাহ অভিভূত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করেন। বস্তুত ইসলামের প্রচার ও প্রসারে রাসূলুল্লাহ সা. এর ঐতিহাসিক এসব পত্রসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য ইতিহাসের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ সা. এসব পত্রাবলী সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও উমর রা. ও মুঘল সম্রাট আলমগিরের প্রশাসনিক পত্রাবলি আমাদেরকে ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জোগান দিয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর রাজনৈতিক পত্রাবলি পাঠে আমরা মুঘল শাসনের শেষদিকে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা ও আলিমদের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথের অনুসন্ধান্য পাই। এসব পত্রে তারা প্রকাশ করেছেন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ। আগামী দিনে যা গবেষকদের উপকৃত করবে। তাই বলা যায় বিভিন্ন যুগের আরবী পত্রসমূহ ইতিহাসের অন্যতম সম্পদ। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এসব পত্রাবলী অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে।

৬.১০ প্রশাসনিক দস্তাবেজ

আব্বাসীয় আমলের প্রারম্ভে তালাসের যুদ্ধ সংঘটিত হলে মুসলমানদের হাতে কাগজ নির্মাণের ফর্মুলা চলে আসে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় কাগজকল। ফলে ধীরে ধীরে মুসলিমবিশ্বে কাগজ সহজলভ্য হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় ফরমানগুলোও কাগজে লেখা হতে থাকে। এসব ফরমানে আমরা ইতিহাসের অনেক তথ্য পাই। কখন কোন শাসক কোন এলাকায় কী ধরনের আদেশ জারি করেছিলেন তার স্পষ্ট বর্ণনা মেলে এসব ফরমানে। ফলে প্রশাসনিক ফরমানগুলোও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ফরমান। এসব ফরমানের কিছু অংশ সরাসরি টিকে আছে এখনো। আর কিছু অংশ ঐতিহাসিকরা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব নিয়ে গবেষকরা নানা আঙ্গিকে কাজ করে যাচ্ছেন। মুঘল আমলের অনেক সরকারি ফরমান এখনো লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস, খোদাবক্স লাইব্রেরি পাটনাসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভে টিকে কাছে।

৬.১১ অসিয়তনামা

মৃত্যুর আগে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ওসিয়াত লিখে যাওয়ার ধারা বেশ পুরোনো। সালাফদের অনেকেই মৃত্যুর আগে ওসিয়াতনামা লিখে যান। এসব ওসিয়াতে অনেক সময় তারা এমনসব বিবরণ লিখে যান যা তারা জীবিত অবস্থায় লেখার সাহস করেননি। তারা এতে এমন অনেক সত্য প্রকাশ করে দেন যা জীবিত অবস্থায় বললে জীবনের আশঙ্কা ছিল। এজন্য ওসিয়াতনামাও হয়ে ওঠে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।[১৭]

ইতিহাসবিদ সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নন এবং সবকিছু কারো কাছে শোনাও কঠিন। বিস্তারিত জানতে অন্যান্য মাধ্যমের উপর ভরসা করতে হয়। বিশেষত পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস তিনি অন্যান্য মাধ্যম থেকেই গ্রহণ করেন। এ মাধ্যম লেখা আকারে থাকলে তাকে লিপিবদ্ধ উৎস বলা হয়। এতে চিঠিপত্র, ফরমান, রশিদ, অঙ্গীকারনামা, সরকারি রেকর্ড ও সব ধরনের লিখিত উৎস অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিকের জন্য আগের যুগের গ্রন্থাদি থেকে উপকৃত হওয়া জরুরি। কেননা দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমার কারণে অতীতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার অন্য কোনো মাধ্যম বাকি থাকে না। এ অবস্থায় অতীতের ইতিহাসগ্রন্থ থেকেই উপকৃত হওয়া সম্ভব।

একজন দক্ষ ইতিহাসবিদ সব ধরনের লিখিত উৎসকে গুরুত্ব দেন। কেবল লাইব্রেরিতে বিদ্যমান গ্রন্থাদি থেকে সূত্র উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হন না। আর তিনি যে সব গ্রন্থ বা লেখা থেকে তথ্য নেন, সেগুলোর সূত্র অবশ্যই উল্লেখ করেন।

উপর্যুক্ত লিখিত উৎস ছাড়াও নিম্নে ইতিহাসের আরো কয়েকটি উৎসের বর্ণনা দেওয়া হলো:

৬.১২ চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করা

ঐতিহাসিকের নিজের জীবনে বা নিজ যুগে প্রত্যক্ষ করা ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা। যেমন- মুঘল সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দীন বাবরের (মৃ. ১৫৩০ খ্রি.) তুযুকে বাবরী, হুমায়ননামা, তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর ও আফগান শাসক আমীর আবদুর রহমান (মৃ. ১৯০১ খ্রি.) রচিত ‘তাজুত তাওয়ারীখ’ তাদের চাক্ষুষ বিবরণ সম্বলিত। ইতিহাসবিদদের এ ধরনের বিবরণকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয়, যদি তা সমকালীন অন্যান্য ইতিহাসবিদের সর্বসম্মত বিবরণ এবং অন্যান্য স্পষ্ট দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

৬.১৩ শুনে শুনে বর্ণনা

ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস *‘আসারে মানকুলা’* অর্থ্যাৎ ইতিহাসরচয়িতা সমকালীন লোকদের থেকে শুনে শুনে যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এর মধ্যে দরবারের আমলা, শাসক, দূত, আলিমসমাজ, সেনাপতি, সৈন্য, ব্যবসায়ী, পর্যটক, প্রবীণ ও সাধারণ মানুষও থাকে, যারা বর্তমান বা নিকট অতীতের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে অথবা অবগত আছে এবং তাদের উপর আস্থা রাখা যায়।

৬.১৪ প্রাচীন নিদর্শন

ইতিহাসের সর্বশেষ উৎস হলো প্রাচীন নিদর্শন। এতে প্রাচীন এলাকা, পুরনো কেল্লা, ধ্বংসাবশেষ, খননের মাধ্যমে বের হওয়া ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন (প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব) অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন নিদর্শনের মাধ্যমে কোনো ঘটনার প্রমাণাদি গ্রহণ করা যায় অথবা একাধিক সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। তবে এর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ কোনো ঘটনা সাজানো অসম্ভব।[১৮]

ইতিহাস অধ্যয়ন ও তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে এই উৎসগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তবে একজন সাধারণ পাঠক চাইলেই সবগুলো উৎস থেকে উপকৃত হতে পারেন না। যেমন একজন সাধারণ পাঠক চাইলেই প্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপি বা ফরমানের পাঠোদ্ধার করতে পারবেন না। এজন্য তাকে গবেষকের শরণাপন্ন হতে হবে।

৭. ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়নের মূলনীতি

কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে ইতিহাস অধ্যয়নের কতিপয় মূলনীতি নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. যেকোনো কাজ বিশুদ্ধ নিয়তে করা একজন মুমিনের কর্তব্য। খালেস বা বিশুদ্ধ নিয়ত রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইতিহাস অধ্যয়ন কর আবশ্যকা। উল্লেখ্য যে, এটি কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের বিধিবিধানকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে সহায়ক, তবে এটিই চূড়ান্ত কিংবা শরী‘আতের উৎস নয়। তাই ইতিহাসকে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাতের আলিম-ফকীহদের স্বতঃসিদ্ধ রায়ের বিরুদ্ধে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করানো যাবে না।

২. ইতিহাসের উপাদানসমূহ স্থান-কাল-পরিস্থিতিভেদে একেক সময় একেক ফলাফল নির্দেশ করে। কখনো তা বিপরীতমুখীও হতে পারে। তাই ইতিহাস অধ্যয়নের সময় এর সীমাবদ্ধতা ও পরিসর সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে।

৩. ইতিহাস আমাদের জীবনের বহু কার্যাদির বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ ও শিক্ষা লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মুশাজারাতে সাহাবা তথা সাহাবীদের পরস্পরের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ ও বিবাদমূলক ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সত্যতা যাচাই-বাছাই করতে হবে, সত্যতার প্রমাণ মিললেও ফকীহ ও সালাফদের তাদের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি অবলম্বন করতে হবে। অনর্থক ও অন্যায় সমালোচনা ও প্রলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা যার ওপর নির্ভর করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক কিংবা জিহাদ ও যুদ্ধক্ষেত্রে শোচনীয় ও নাজুক পরিস্থিতিতে তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাঝে বিভিন্ন কলাকৌশল ও নতুন পদ্ধতির সমাবেশ ঘটিয়ে বর্তমানের জন্য উপযোগী করে তুলতে হবে।

৫. ঐতিহাসিকদের তবাকাত তথা স্তর, মর্যাদা, খ্যাতি, গ্রহণযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা, মাযহাব এবং তাদের লেখালেখির ধরণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তারপর তা সামনে রেখে তাদের কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে। কেননা কোনো ফাসেক ও কাফেরের পক্ষ থেকে লিখিত ইতিহাসসংক্রান্ত কিতাবাদি ও তথ্য-উপাত্ত হতে উপকৃত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। একান্ত প্রয়োজন হলে ইসলামী ইতিহাসে বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও নেককার ব্যক্তি থেকে ইতিহাসের জ্ঞান আহরণ করতে হবে। অন্যথা জ্ঞানপাপীদের থেকে বিপগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি উম্মাহর বিজ্ঞ আলিমদের বিরুদ্ধে যারা বিষোদগার করে, জনসাধারণের সামনে তাদের কলুষিত করতে চায় সেইসব ব্যক্তিদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদথেকে পাঠক ও চর্চাকারীকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে।

৬. ইতিহাসে স্থান পাওয়া সকল বিষয় সঠিক বা সত্যের মানদণ্ডে নিরূপিত নয়। সকল ঐতিহাসিক এমনকি ইসলামী ঐতিহাসিকগণের ইতিহাসসংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও অসার গল্প, কিসসা- কাহিনীও বিদ্যমান রয়েছে। ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা বশত অনেক মিথ্যা সাক্ষ্যও বিদ্যমান রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী ইতিহাসের ওপর যে-সকল কিতাব আছে তা কোনো ভালো শাস্ত্রজ্ঞানী আলেমের অধীনে অধ্যয়ন করা উচিত। যে আলিম একাধারে ইতিহাসেরও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন আবার ইসলামী মূল্যবোধ ও আকিদা সম্পর্কেও ভালো জ্ঞাত ও সচেতন আছেন এমন একজনের নিকট ইতিহাস চর্চা করা উচিত।[১৯]

৮. প্রবন্ধের ফলাফল

১. বর্তমানে আমাদের শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের জ্ঞান হাসিলের জন্য মুখ্য ও গৌণ উৎস বাদ দিয়ে ফটোকপি উৎস ব্যবহার করে কেবল ডিগ্রি অর্জন করছে, জ্ঞানের রুদ্ধদ্বার অর্গলমুক্ত করতে পারছে না। আরবী-ফার্সী ভাষা তো দূরের কথা, ইংরেজি ভাষাও তাদের কোনো দখল নেই। এমনকি বাংলা ভাষাও স্পষ্টভাবে ভাব প্রকাশ করতে তারা হিমশিম খেয়ে যায়। এটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। ইতিহাসচর্চা বা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মুখ্য উৎসের বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে, কিন্তু বাস্তবে সমসাময়িক ও নিকট সমসাময়িক লিখিত ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গ্রন্থাদি ও প্রণেতাদের গুণাগুণ বিচার এবং সমালোচনা-পর্যালোচনা পর্যন্ত তার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে তোলা হয়েছে।[২০] ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি জানার মাধ্যমে ইতিহাসের মুখ্য ও গৌণ উৎস বিচার বিশ্লেষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে ও সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান ও জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

২. ইতিহাস আমাদের অতীত সম্পর্কে জ্ঞানদান করে এবং অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। ইতিহাসের আলোকে আমরা বর্তমানকেও বিচার করতে পারি। ইতিহাস অধ্যয়ন জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতির ঐতিহ্য ও অতীতের গৌরবান্বিত ইতিহাস ওই জাতিকে বর্তমানের মর্যাদাপূর্ণ কর্মতৎপরতায় উদ্দীপিত করতে পারে।

৩. ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি জানার মাধ্যমে ভিত্তিহীন বা মনগড়া বর্ণনার স্বরূপ উন্মোচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কতিপয় রাবী ইমাম শাফি'ঈ র. (মৃ. ২০৪ হি./৮২০ খ্রি.) এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছিল যে, একবার খলিফা মামূন পরীক্ষা করার জন্য তাকে এত বেশি নাবীয পান করান, যতটুকু পান করলে সাধারণ মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার উপর কোনো প্রভাব পড়েনি। ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী র. (মৃ. ৮৫২ হি./১৪৪৮ খ্রি.) '*লিসানুল মীযান*' গ্রন্থে ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এটা ভিত্তিহীন বর্ণনা। কেননা ইমাম শাফি'ঈ র. এর সঙ্গে খলীফা মামূনের সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণিত নয়। এছাড়া তিনি যুক্তি দেন, ইমাম শাফি'ঈ র. এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বলতেন, 'আমার যদি আশঙ্কা হয় যে ঠাণ্ডা পানি আমার বোধশক্তিতে বিঘ্ন ঘটাবে, তবে আমি সারা জীবন গরম পানিই পান করব।' এমন ব্যক্তির ব্যাপারে অধিক পরিমাণে নাবীয পান করার বর্ণনা কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস ইতিহাস শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাই হাদীসের ব্যাখ্যাসমূহ ইতিহাসের মাধ্যমেই দেওয়া হয়ে থাকে। এভাবেই যুগের পর যুগ সঠিক ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি জানার মাধ্যমে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনার স্বরূপ উন্মোচন হয়।

৪. ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি জানার মাধ্যমে ত্রুটিযুক্ত বা মিথ্যা বর্ণনাকারী ঐতিহাসিকগণকে চিহ্নিত করা সম্ভব। হাদীস বর্ণনাকারীদের রাবী বলা হয়। তাদের সম্মান অনেক সুউঁচে। তবুও কিছু রাবী কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই না করেই ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনা করে থাকে। সঠিক সংবাদ যাচাই বা সহীহ হাদীস অন্বেষণে ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয়। আর ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে অতি দ্রুত এসব মিথ্যাবাদী রাবীর মুখোশও উন্মোচন করা যায়। ইমাম মুনাবী র. বলেন, ইতিহাসের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তার মাঝে অন্যতম হলো, খতীব আল-বাগদাদীর সময়ে এক ইয়াহুদী একটি কিতাব নিয়ে এসে আবির্ভুত হয়ে এই দাবী করছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খাইবারের বাসিন্দাদের জন্য জিযিয়ার বিধান রহিত করে দিয়েছেন। আর এই কিতাবে তার সাক্ষ্য উল্লেখ রয়েছে। আর এই বিষয় নিয়ে পরস্পরের মাঝে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। ফলে খতীব বাগদাদীর নিকট তা পেশ করা হলে তিনি তা গভীর পর্যবেক্ষণ করে বলেন, এটা তো মিথ্যা। কেননা এতে মু'আবিয়া রা. (মৃ. ৬০ হি.)-এর সাক্ষ্য উল্লেখ রয়েছে, অথচ তিনি তো ফাতহে মক্কার বছরে (কোনো বর্ণনায় ফাতহি মক্কার দিনে) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর খাইবারের বিজয় তো ৭ম হিজরীতে (যা মু'আবিয়া রা. এর ইসলাম গ্রহণের অনেক পূর্বে। সে হিসেবে তিনি কীভাবে সাক্ষ্য দেবেন!) আর এতে সা'দ ইব্ন মু'আয রা. (মৃ. ৬২৭ খ্রি.) এর সাক্ষ্যও রয়েছে, অথচ তিনি বনু কুরাইজার ঘটনা পর পরই (অর্থাৎ খাইবারের ঘটনার পূর্বে খন্দকের বছরে) মৃত্যুবরণ করেন। এই উত্তর পেয়ে মুসলমানরা বেজায় খুশি হলেন।[২১]

একই ঘটনা ইমাম ইব্ন কাসীর (মৃ. ৭৭৪ হি.) ও আবূ বকর আল-খতীব আল-বাগদাদীর র. আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[২২] এজন্যই ইমাম সুফিয়ান আছ-ছাওরী র. (মৃ. ১৬১ হি./৭৭৮ খ্রি.) বলেন,

لَمَّا اسْتَعْمَلَ الرُّوَاةُ الْكَذِبَ، اسْتَعْمَلْنَا لَهُمُ التَّارِيخَ

'যখন রাবীগণ মিথ্যার অস্ত্র ব্যবহার করে, তখন সেটার (প্রতিরোধে) আমরা তাদের জন্য ইতিহাসের অস্ত্র ব্যবহার করি।'[২৩]

ইসমা'ঈল ইব্ন আইয়াশ র. বলেন, আমি ইরাকে ছিলাম। সেখানে আমার নিকট আহলুল হাদীসরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি খালিদ ইব্ন মাদান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। তাই আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, কোন বছরে আপনি খালিদ ইব্ন মাদানের নিকট থেকে এসব হাদীস লিখেছেন? তখন সে বলল, ১১৩ হিজরীতে। আমি তাকে বললাম, আপনি কি দাবী করছেন খালেদের মৃত্যুর সাত বছর পর তার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। ইসমা'ঈল বলেন, খালিদ ১০৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪]

হাফ্স ইব্ন গিয়াস বলেন,

إِذَا اتَّهَمْتُمُ الشَّيْخَ فَحَاسِبُوهُ بِالسِّنِينَ، يَعْنِي: احْسِبُوا سِنَّهُ وَسَنَّ مَنْ كَتَبَ عَنْهُ

'যদি তুমি কোনো শায়খের (রাবীর) ব্যাপারে দোষারোপ করো, তাহলে তার বয়স দিয়ে বিচার করো, অর্থাৎ তার বয়স এবং তার সম্পর্কে যারা লিখেছেন তাদের বয়স গণনা করো।'[২৫]

হাস্‌সান ইব্ন যায়দ বলেন, لَمْ نَسْتَعِنْ عَلَى الْكَذَّابِينَ بِمِثْلِ التَّارِيخِ. 'মিথ্যাবাদীদের পাকড়াও করতে ইতিহাসের চেয়ে উত্তম সহায়ক আর কিছু নেই।'[২৬]

সুতরাং সত্যের মানদণ্ডে পৃথিবীতে ঘটা প্রতিটি ঘটনার সঠিক ইতিহাস জানতে মিথ্যাবাদী ও ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনাকারীকে সনাক্ত করে তাদের বর্ণিত ইতিহাস পরিত্যাগ করতে হবে এবং অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এজন্য দরকার ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানা; যা অত্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, *ইতিহাসচর্চা ও গবেষণা পদ্ধতি* (ঢাকা: অর্ণব প্রকাশনী, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২।

২ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান আল-কুন্নুজী, *আবজাদুল উলূম*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১১৭।

৩ মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, অনুবাদ: মাওলানা আব্দুল মতীন জালালাবাদী, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৭।

৪ ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত্-তারীখ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা.বি.) পৃ. ৩।

৫ মুহাম্মাদ আস-সাখাভী, *আল-ই'লান বিত্-তাওয়ারীখ লিমান যাম্মাত্-তারীখ* (মিশর: মোস্তফা আল-বাদী আল-হালাভী, তা.বি.), পৃ. ১৭।

৬ ইবনু খালদূন, *তারীখু ইবনু খালদূন* (বৈরূত: দারুল ফিক্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ কি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৩।

৭ মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, অনুবাদ: মাওলানা আব্দুল মতীন জালালাবাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

[৮] মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারীখু ইসলাম* (উর্দু), ১ম খণ্ড (দিল্লী: তাজ কম্পানী, তা.বি.), পৃ. ৩৫।

[৯] পূর্বোক্ত।

[১০] জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ২য় খণ্ড (মিসর: মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৭০ হি./১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ১২৭; আহ্মদ মোল্লা জীওয়ান, *নূরুল আনওয়ার* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৯; মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আয্-যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইয়াহ্ইয়াইল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ২২।

[১১] সূরাহ্ আন্-নিসা, ৪ : ১২২।

[১২] সূরাহ্ হূদ, ১১ : ৪৯।

[১৩] সূরাহ্ ইউসুফ, ১২ : ৩।

[১৪] সূরাহ্ আল-ফাতহ, ৪৮ : ২৯।

[১৫] তাহা হুসাইন, *আত-তাওজীহুল আদাবী* (কায়রো: লাজনাতুত তা'লীফ, তা.বি.), পৃ. ২০-২৩; মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ্-দিয়া, *ফিল আদাবীল আন্দালুসী*, পৃ. ২২৭-২২৮।

[১৬] আহমাদ আল-বালযুরী, *ফুতূহুল বুলদান* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৪৪৮; ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মা'আদ* (বৈরূত: মুআসসিসাতুর রিসালাহ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯; মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, *মাজমূ'আতুল ওয়াসাইকিস সিয়াসিয়্যাহ* (বৈরূত: দারুন নাফাইস, ১৯৮৭ খ্রি), পৃ. ৫০-৫১।

[১৭] ইমরান রাইহান, *ইতিহাস পাঠ প্রসঙ্গ কথা* (ঢাকা: চেতনা ৩য় মুদ্রণ, ২০২৩ খ্রি.), পৃ. পৃ. ৭৩-৭৪।

[১৮] মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল রাইহান, *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ*, অনুবাদ: রাইহান খাইরুল্লাহ, ১ম খণ্ড (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ১ম প্রকাশ, ২০২১ খ্রি.) , পৃ. ৮৩-৮৪।

[১৯] ইমরান রাইহান, *ইতিহাস পাঠ প্রসঙ্গ কথা*, পৃ. ৩১-৩৩; ড. রাগিব সারজানি, *ইসলামি ইতিহাস* (সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ), অনুবাদ আবু মুসআব ওসমান, ১ম খণ্ড (ঢাকা: মাকতাবাতুল হাসান, ১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২০ খ্রি.), পৃ. ৩১-৩২।

[২০] ড. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী ও রুহুল কুদ্দুস মো. সালেহ, *মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩-৪।

[২১] মুনাবি, *ফাইজুল কাদির শারহুল জামি'উস্-সাগীর*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

[২২] ইব্ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২শ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা.বি.), পৃ. ১০৮।

[২৩] ইবনুস সালাহ্, *মুকাদ্দামাতু ইবনিস্ সালাহ্*, তাহকীক: নূরুদ্দীন আতার (বৈরূত: দারুল ফিক্র আল-মু'আসির, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৮০; ইব্ন আসাকীর, *তারীখু দিমাশক*, তাহকীক: আমর ইব্ন গুরামাহ আল-উমরী, ১৬শ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০৪; খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াহ্* (আল-মাদীনা আল-মুনাওয়ারাহ: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১১৯; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবুন নাবাবী, তাহকীক: আবূ কুতায়বাহ নাযর মুহাম্মাদ আল-ফারিইয়াবী, ২য় খণ্ড (দারুত্ তাইয়্যেবাহ, তা.বি.), পৃ. ৮৬৬।

[২৪] মূল আরবী ভাষ্য নিম্নেরূপ

﴿إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْعِرَاقِ، فَأَتَانِي أَهْلُ الْحَدِيثِ، فَقَالُوا: هَاهُنَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيَّ سَنَةٍ كَتَبْتَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؟ فَقَالَ: سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يَعْنِي وَمِائَةٍ فَقُلْتُ: أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَبْعِ سِنِينَ؟ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: مَاتَ خَالِدٌ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَةٍ﴾

দ্র. ইবনুস সালাহ্, *মুকাদ্দামাতু ইবনিস্ সালাহ্*, পৃ. ৩৮০; ইব্ন আসাকীর, *তারীখু দিমাশক*, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২০৪।

[২৫] খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ্*, পৃ. ১১৯; ইব্ন আসাকীর, *তারীখু দিমাশক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; ইবনুস সালাহ্, *মুকাদ্দামাতু ইবনিস্ সালাহ্*, পৃ. ৩৮০; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬৬।

[২৬] ইব্ন আসাকীর, *তারীখু দিমাশক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬৭।